চলচ্চিত্রে ক্যামেরা

গুদাস ভট্টাচার্য

সামনে যা পায়, সেলুলয়েডের বুকে তাকে হুবহু ফুটিয়ে তোলা ক্যামেরার চিরকালের স্বভাব। তা বলে সে ছবি সত্যিই হুবহু হয় না, যন্ত্রটার জন্যেই হয় না। আলো - ছায়ার হেরফের হয়, বাস্তবের তিন ডাইমেনশন পরিণত হয় দুই ডাইমেনশনে, তার মধ্যে তৃতীয়ের অর্থাৎ বেধের আভাস থাকে। তাছাড়া, এ যন্ত্রের ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ, যে মানুষের বুদ্ধি আছে, মন আছে। যন্ত্র ও যন্ত্ররাজে সহযোগিতায় পর্দার বুকে তৈরি হয় এক নতুন জগৎ। অন্ধকার ঘরে, নিশ্চল সিটে বসে আমরা চোখে এঁটে নিই ক্যামেরার চোখ, তাকে অনুসরণ করে চলি ফিরি ঘুরি, রোমিওর চোখ দিয়ে জুলিয়েটকে দেখি উঁচু ব্যালকনিতে, জুলিয়েটের চোখ দিয়ে দেখি নীচে রোমিওকে, এক আলোকিত আশ্চর্য নতুন জগতের আধিবাসী হয়ে যায়। পরিচালক নানাভাবে এই নতুন মায়ার জগৎ তৈরী করেন। তাঁর সৃষ্টির মাধ্যম - ক্যামেরা। তার শিল্পসম্মত প্রয়োগে চলচিচত্র হয় আর্ট। ক্যামেরা স্থির, আবার সচলও। দু-ভাবেই সে ছবির দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। সে পিছিয়ে আসে, দূরযানী প্রকৃতির বিরাট বৈচিত্র ফুটে ওঠে আমাদের সামনে, সে এগিয়ে যায় খুব কাছে, অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের ক্ষুদ্র জগতও উদভাসিত হয়ে ওঠে - যে জগৎকে আমরা জানতাম না বা অল্প জানতাম, যেমন কীটের সংসার, মুরগীর পারিবারিক ট্র্যাজেডি, ফুলের ভালবাসা, হৃদয়ের ভালবাসা, অবচেতন মনের জটিল বুনুনী। পুরনো জানা জগৎ নতুন অর্থে ধরা দেয়, যেমন পদ্মপাতায় ফড়িংয়ের নাচ, দেওয়ালের দেহে ছায়ার ভীষণতা, গম্ভীর পাহাড়ের অবিচল স্তব্ধতা, কিংবা অভিমানী নরম ঠোঁটে মানভঞ্জন - আঙুলের সহৃদয় স্ট্রোক, অথবা চোখের তারায়তারায় উচছলিত শব্দহীন অজস্র ভাষা।

জড় কিভাবে চেতন হয়ে ওঠে 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'য় তার বর্ণনা সকলেই পড়েছেন। চলচিচত্রে এই বর্ণনাকে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করে তোলা যায়। এমন কি, অচলও এখানে একটুও না নড়ে সচল হয়ে ওঠে। যেমন, আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন' - এ পরপর তিনটে পাথরের সিংহের শট আছে - মনে হয়। যেন একটাই সিংহ শুয়ে ছিল, মুখ তুলল, উঠে বসল। এঁর 'অক্টোবর' ছবিতে বস্তুকে প্রতীক করে তোলা হয়েছে, বিপ্লবীদের জাহাজ থেকে কামান গর্জে উঠল, ডিকটেটর কেরেন্স্কীর প্রাসাদের হাজার রোশনাই ঝাড়লণ্ঠন কেঁপে উঠল, দুলতে লাগল, সিলিংএ চিড়, একটা হুক আলগা হয়ে এল, শেষে সবশুদ্ধ ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে - অভিজাত্যের স্বৈরাচারের প্রতীক ঐ ঝাড়লণ্ঠন।

মানুষকে, মনকেও ক্যামেরা দেখায় তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, দূরত্ব - কোণ - আলো - আচরণ ইত্যাদি অনেক হিসেব করে। দুজনে কথা বলছে, টেনিস বলের মত ক্যামেরা যাতায়াত করছে একবার এ - মুখ, একবার ও - মুখ, একবার ও - মুখের ওপর। প্রথমশটে দেখলেন মৃত জোয়ান ছেলের বাবা মুখ - পাথরের মত নির্বাক; পরের শটেই - চেয়ারের হাতল ঘিরে হাতের আঙুলগুলো থরথর কাঁপছে; ঝড় চলছে বুকের মধ্যে। সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিতা'য় সর্বজয়া ফিরে আসছে দেশে, ট্রেনে চেপে; পর্দার বুকে ওর স্তব্ধ মুখ, মুখের ওপাশে জানলা, জানলার ওপাশে ব্রীজের সোজা - বাঁকা ফ্রেমগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে সদ্যোবিধবার দুশ্চিন্তার ইঙ্গিত দিয়ে। এগিয়ে - পিছিয়ে, একোণ - সেকোণ থেকে ক্যামেরা চরিত্রকে প্রকাশ করে হঠাৎ ধীরে ধীরে। একোণ - সেকোণ থেকে ক্যামেরা চরিত্রকে প্রকাশ করে হঠাৎ বা ধীরে ধীরে। একটা ছবিতে একটি মেয়ে শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, অকস্মাৎ এক মহিলা পুলিসের আবির্ভাব, ক্যামেরা তাকে ধরেছে মাটি থেকে মুখ তুলে; মনে হয়, যে জনৈকা দানবী। দুপঁর 'ভ্যারাইটি' দূর থেকে মেয়েগুলিকে দেখাচ্ছে সুন্দরী, আকর্ষণীয়া; তার টানে - টানে এগোতে - এগোতে কাছে এসে - আরে দূর! দুস্তিভিয়ের এর একটা ছবিতে ডাক্তারটি বেশ সুন্দর স্বচ্ছ, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ক্যামেরারা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ফুটে উঠতে থাকে ওর চরিত্রের কুৎসিত কুশ্রীতা। ক্যামেরা চরিত্রের চোখ দিয়েও দুনিয়াকে দেখায়। অনেক উঁচু থেকে রেলগাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন খেলনা। ডেভিডসন তাঁর 'থার্ড অ্যাভিনিউ এল'এ এইভাবেই শটটা নিয়েছেন। নবজাতক শিশুর চোখে খাট-টেবল-সোফা-বেসিন-বাথটাব কেমন দেখায়? কোহেন-সীট তার ধ

ারণাদিয়েছেন মেঝে থেকে ঊর্ধ্বমুখী শট নিয়ে, আর কার্পেটের ছবি নিয়েছেন ক্লোজআপে। মনের সঙ্গে ক্যামেরার চলনের আশ্চর্য সঙ্গতিফেইদারের 'পেনসন মিমসার্স এ মা রেগে ও বেগে ছেলের ঘরে ঢুকছে - ক্যামেরার চোখ নীচে থেকে ঊর্ধমুখী; মা ছেলেকে মারল - ক্যামেরার মুখ সোজাসুজি; অনুতপ্তা মা কৌচে বসে কাঁদছে - নতমুখী ক্যামেরা।

যখন দৃশ্যে কোন অসৌন্দর্য, চরিত্রে কোনো জটিলতা দেখাবার দরকার হয়, ক্যামেরা তখন বেছে নেয় তির্যক বা প্রবুদ্ধ কোণ, কিংবা অস্থিরভাবে নড়াচড়া করে। এ দৃশ্য তো হামেশাই দেখেছেন। কিন্তু ছবিকে হেলিয়ে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত রেখেছেন আইজেনস্টাইন তাঁর 'অক্টোবর'এ অনেক মিলে একটা কামান ঠেলার দৃশ্যে। ছায়ার সাহায্যে চরিত্র, বক্তব্য প্রকাশের কৃতিত্বও তাঁর অসাধারণ ছিল।

ক্লোজআপ ও লংশটে, ব্যাকগ্রাউন্ড ও ফোরগ্রাউন্ড পরিপার্শ্ব ও মানুষে কন্ট্রাস্ট বা বৈপরীত্য সৃষ্টি করেও চিত্রভাষা গড়েওঠে। 'এ ম্যাটার অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ' -এ শট নেওয়া হয়েছে বিচারকের পিঠের কাছ থেকে; ফলে তাঁকে দেখাচ্ছে বিরাট, দূরে নীচে আসামী দাঁড়িয়ে, অনেক ছোট। আন্তানিওনির 'ইল গ্রিদো'র শেষ দৃশ্য নায়ক টাওয়ারের ওপর থেকে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, অনেক নীচে খুব ছোট্ট নায়িকার শরীর, ওপরে তাকিয়ে আছে। ত্রুফোর একটি ছবিতেও নিহত প্রেমের মুহূর্ত এইভাবে গড়ে উঠেছে উঁচু ছাদের ওপর থেকে নায়ক দেখছে অনেক নীচে পথে নায়িকা বেরিয়ে এল, গাড়িতে চড়ল, চলে গেল।

কন্ট্রাস্ট আরও অনেকভাবে আনা যায়। ছবির নাম 'ইমিগ্রান্ট' জাহাজের সবাই সি - সিকনেস্ -এ আক্রান্ত হয়েছে; দর্শকের দিকে পিঠ, রেলিংয়ে ঝুঁকে এলোমেলো পা ছুড়ছেন চার্লি চ্যাপলিন; সবাই ভাবছে, উনিও জাহাজে চড়ার খেসারৎ দিচ্ছেন। হঠাৎ চার্লি ঘুরে দাঁড়ালেন - লাঠি দিয়ে একটা মাছ ধরেছেন। কার্ল ড্রেয়ারের 'প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক' সারি সারি পাথরের আসন, বিচারকরা বসে আছে পাথরের মূর্তির মত, একজন হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সমস্ত স্ক্রীন জুড়ে - এক বিরাট দৈত্যের মত। রেনে ক্লেয়ারের 'এন্ত্রাক্তে' কাঁচের ওপর ব্যালে নর্তকী নাচছে, কাঁচের তলা থেকে ক্যামেরা চার্জ করা হয়েছে; স্কার্টটা উঠছে নামছে পদ্মের পাপড়ির মত, তার মাঝখানে দুটি সুগঠিত লীলায়িত পায়ের লীলা - যেমন জোড়া পরাগকেশরের ছন্দিত প্যান্টোমাইম। অন্যত্র যা নাইট, এখানে তা কবিতার সামিল।

শুধু দৃশ্য বা অর্থ নয়, ক্যামেরা দৃশ্যের আরও গভীরে, মনের আরও অতলে যেতে পারে। মের 'দ্য ঘোস্ট্ দ্যাট নেভারিটার্নস্' -এ জেলখানায় দাঙ্গা বেধেছে, বাড়িটা হেলে হেলে যাচ্ছে, যেন পড়ল বলে। এটা বাইরের ছবি। মুরনোর 'লাস্ট্ লাফ' - এপদ - অবনত দরোয়ান ওর পুরনো পোশাকটা চুরি করে পালাচ্ছে; নেশা - কাটানোর দাওয়াই এক পেগ; সব স্বচ্ছ স্থির সংযত। কারেল জেমানের 'এ জেস্টার্স টেলে'র মাতাল কিন্তু অন্যরকম দেখছে কাঠের দোতলা বাড়িটা কেমন-যেন জলীয় পদার্থ হয়ে গেছে। একটা হেঁচকি তুলল, বাড়িটা কেঁপে উঠল; আর একটা হেঁচকি, বারান্দা ভেঙে হুড়মুড় করে একটা লোক পড়ে গেল। একই হাইড্রো - ইলেকট্রিক স্টেশন, সেই ফার্নেস - ক্রেন - চিমনি - হুইল ইত্যাদি, কিন্তু চার কোণ থেকে তার চারটে আলাদা রূপ ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন 'ইভান' - এর পরিচালক দভঝেন্কো গ্রামের চাষী ইভানের চোখে স্টেশনটি ভয়ঙ্কর দানব; ও যখন শ্রমিক হল, তখন এরাই আবার সুন্দর হয়ে উঠল; ছেলে কারখানার মেশিনে কাটা পড়েছে, মা-র চোখে স্টেশনটি জঘন্য পশু; মৃত ছেলেকে যখন শহীদের সম্মান দেওয়া হল, এই যন্ত্রপুরীই তখন তার চোখে এক নতুন মন্দির। একটা বিস্ময় দৃশ্য আছে কন ইচিকাওয়ার 'দি কী'তে বৃদ্ধ,মরতে বসেছে, যৌনদক্ষতা বিলুপ্ত, তবু কামনার অন্ত নেই; বসে বসে স্ত্রীর দেহটা দেখছে আর লালায়িত হচ্ছে; দেখতে দেখতে স্ত্রী সোনালী চামড়া রূপান্তরিত হয়ে গেল মভূমির বালিতে - ইম্পোটেন্ট্ কামনার সঙ্কেত। অন্যদিকে, 'প্যানটম'-এ বাড়িগুলো দুলতেদুলতে দ্রুত সরে যাচ্ছে, সিঁড়ি এগিয়ে সে আবার পিছিয়ে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে, একটা হাত, একটা মুখ, এক ঝলক আলো, মেঝেতে রিভলবার - প্রায় উন্মাদ নায়কের মানস - দশান। এবং প্রায় - কবিতা।

চলচ্চিত্র গতিশীল ছবির সমষ্টি। এখানে বিষয় নড়ে, ক্যামেরা নড়ে, ছবির ফ্রেম ছোটে সেকেন্ডে ষোলটা (নির্বাক) ও চব্বিশটা (সবাক) হিসেবে। বিষয় বলতে জড়বস্তু ও মানুষ, দুই-ই।

এই জাতীয় ছবি তুলতে হলে 'ফ্রেমিং' ও 'কম্পোজিশন' অর্থাৎ ছবির চৌকো চৌহদ্দীর মধ্যে কে থাকবে, কে থাকবে না,কোতায় কিভাবে থাকবে, পুরো হিসেব করে নিতে হয়, একটা বড় দৃশ্যকে কেটে কেটে ছোট করে নিতে হয়, তিনজনের মধ্যে তেকেএকজনকে, দেহ থেকে মুখকে, মুখ থেকে চোখকে আলাদা টুকরো করে দেখাতে হয়। তার সঙ্গে মিলিয়ে ক্যামেরার

আচরণ। এবং সেট ও আলো প্রসঙ্গে অনেক ভাবনা, পরিকল্পনা। তখন 'হিরোশিমা মন্ আমুর' - এর নায়িকার নগ্ন পিঠকে মনে হয় আনবিক বোমাহত শিরোশিমা মাটি বা মানুষ, 'ক্যালিগরী'র পরিপার্শ্বকে পাগলাগারদ, 'ইভান দ্য টেরিবল্' -এর মুখকে মনের মানচিত্র, 'নায়ক' - রে দুটো ট্রেনের স্বাভাবিক পাসিংকে দ্বৈধ-চিত্তের প্রায়-কলিশন।

চলচ্চিত্র গতিশীল ছবির সমষ্টি। এখানে বিষয় নড়ে, ক্যামেরা নড়ে, ছবির ফ্রেম ছোটে সেকেন্ডে ষোলটা (নির্বাক) ও চব্বিসটা (সবাক) হিসেবে। বিষয় বলতে জড়বস্তু ও মানুষ, দুই-ই।

'পটেমকিন' -এ উত্তেজনার চূড়ান্ত মুহূর্ত তৈরি হয়েছে জাহাজের কলকব্জা গতিবেগ দিয়ে। শিল্পী কিভাবে চললে নড়লে ছবির ছন্দের সঙ্গে মেলে, সে রহস্য জানতে চার্লি চ্যাপলিন ও বাসটার কীটন; জানতেন না হ্যারল্ড্ লয়েড, তাই তিনি মুছে যাচ্ছেন অতি দ্রুত। আর, ক্যমেরা থেকেও কথা বলে, চলতে চলতে তো বলেই। যেমন, ওয়াইলারের 'লিট্ল্-ফক্সেস্'-এ হার্ট অ্যাটাক হয়ে স্বামী টলতে টলতে চলে যাচ্ছে, স্ত্রী বসে আছে মুখ গোঁজ করে - ক্যামেরাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। 'রেড শু'তে লারমনটভ পা বাড়াতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল আমাদের মুখোমুখি, ক্যামেরা পিছিয়ে আসতে আসতে ফ্রেমের তলায় জেগে উঠল রক্তকেশিনী এক মেয়ের মাথা, যে মেয়েটি ওকে ভালবাসে। বিয়ের রাতে মাতাল হয়ে বাড়িতে ঢুকেই বর আছাড় খেয়ে, চারপাশে নিমন্ত্রিতদের জমাট - জটলা;ক্যামেরা ঘুরছে ওদের চারপাশে, কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না, একটু উঁকি দেওয়া যায় কিনা (দে নো হোয়াট দে ওয়ানটেড)। আবার, 'দ্য ফোর ডেভিল্স্'-এ সার্কাসের বৃত্তে ছুটন্ত ঘোড়াকে ক্যামেরা এমনভাবে ফলো করে, মনে হয়, ঘোড়াটা মাঝখানে স্থির দাঁড়িয়ে, ঘুরছে চারপাশটা। ইলেক্ট্রা কাঁদতে কাঁদতে পিতার কবরে লুটিয়ে পড়ল, মুহূর্তে ক্যামেরার মুখ ঘুরে গেল সুইপ্ করে, কান্না যেন ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময় (ইলেকট্রা ক্যাকোইয়ান্নিস)

ক্যামেরার গতি একটি নিয়মিত ছন্দে। তার থেকে ধীরে বা দ্রুত, স্লো বা অ্যাকসিলারেটেড্ও করা যায়। আইজেনস্টাইনের একটা ছবিতে অফিসে কাজ হচ্ছে খুব ধীরে। ছবির তখন স্লো মোশন; হঠাৎ টেবিলে একটা ঘুষি, মেশোন দ্রুত কেরানী উড়ছে, ফাইল উড়ছে, ঝপঝপ সই সরে যাচ্ছে। শীলমোহর পড়ছে, টেব্ল্ ফাঁকা। গতি আরও দ্রুত ও বিচিত্র হয় জুমিং - এ। যেমন, চালতা যখন বাইনোকুলার দিয়ে স্বামীকে দেখছে; কিংবা, বৃদ্ধটি জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল, পথের খোয়াগুলো মুহূর্তের জন্যে দর্শকের দিকে ছুটে এল সুইসাইডের ব্যঞ্জনা জাগিয়ে (উমবার্টো ডি/ ডি সিকা)।

ক্যামেরা - শিল্পে ক্লোজআপ যেমন অতিশয় মূল্যবান, তেমনি ফোকাসের হেরফেরও। ও স্বামীর বিচার হচ্ছে, মৃত্যুদন্ডও হতে পারে; স্ত্রীর মুখের, পরমুহূর্তে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ক্লোজআপ, আঙুলগুলো চামড়া কেটে বসেছে (ইন্টলারেন্স গ্রিফিথ)। চালতার পাশে অমল; স্বামীর গাড়ি এল। অমল ঝাপসা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। 'এলডোরাডো'র নায়িকা বন্ধুর মাঝখানে থেকেওযখন আত্ম -ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে, ওর নিজের ছবিটা তখন ঝাপসা অস্পষ্ট।

শিল্প স্থান - কাল-নিভর। চলচ্চিত্র যেমন স্থান -কালকে -মাধ্যাকর্ষণকে মেনে চলে, তেমনি এদের পেরিয়ে নিজস্ব স্থান - কাল - পারিপার্শ্বও তৈরি করতে পারে।। তখনই রূপ নেয় তার নিজস্ব নতুন জগৎ 'চলচ্চিত্র-বাস্তবতা' যেখানে গল্প - উপন্যাস - নাটক - কবিতা সুর - ছন্দের আশ্চর্যসুন্দর প্রকাশ। কিন্তু সে আলোচনা আরেক নাতিশীতোষ্ণ অবকাশে।

আপাতত উপসংহারে বক্তব্য চলচ্চিত্রের এই নিজস্ব বাস্তবতা, এই নতুন জগৎ উপলব্ধি ও উপভোগ করতে হলে আমাদের সহজাত স্বভাবজ দৃষ্টিভঙ্গীকে ভুলে গিয়ে ক্যামেরার চোখ তথা লেন্সের দৃষ্টি - ভঙ্গি দিয়ে ছবিকে দেখতে শিখতে হবে। এবং একমাত্র তখনই ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের রস স্ফূর্ত হবে স-হৃদয় চিত্তে।